চরিত্র সমীক্ষা

দুষ্যন্ত ঃ

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের নায়ক হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত। নাটকে দুষ্যন্ত চরিত্রটি একাধিক কারণে বিশেষ উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত নায়ক দুষ্যন্ত ধীরোদাও ক্ষত্রিয় তেজবান পুরুষ। নাট্যকার নায়ক চরিত্রটিকে কলঙ্কমুক্ত করেননি। দুষ্যন্তের বহুবিধ গুণ কিন্তু দোষ একটিই—সেটা হল যে বাসনাসক্তি। দুষ্যন্তের গৌরব এবং মাহাত্ম্য বোঝবার জন্য কখনও তাকে পিনাকী মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন — 'মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যমিব পিনাকিনম্'। আবার সেনাপতির চোখে তিনি পর্বতবিহারী হস্তী — 'গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি।' দুষ্যন্ত ছিলেন সুরূপ এবং আনন্দদায়ক সুবক্তা। নানা কারুকলাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর দুষ্যন্ত রাজকার্য পরিচালনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে তপোবনের পরিবেশ এবং মুনিগণের তপস্যা ইত্যাদি ব্যাপারে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। মৃগয়াপ্রিয় রাজা আশ্রমের মৃগশিশুটিকে বধ করবার জন্য শরসন্ধান করছিলেন। কিন্তু তাপসগনের নিষেধ বাক্য শুনেই তিনি নিজেকে সংযত করেছেন।

তপোবনে আশ্রম কন্যা শকুন্তলাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় চিত্রটি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। রাজার প্রেমিক হৃদয়ের এক অপূর্ব পরিচয় এই অংশটুকুতে আছে। শকুন্তলার সঙ্গে তিনি অত্যন্ত মর্যাদা পূর্ণ ব্যবহার করেছেন তবে প্রেম নিবেদনে তিনি ছিলেন কুণ্ঠাহীন। তৎকালের রীতি অনুসারে রাজা দুষ্যন্তেরও একাধিক মহিষী ছিলেন। কিন্তু শকুন্তলা যে কোনোমতেই বঞ্চিতা হবেন না একথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে ছিলেন রাজা। শকুন্তলার প্রতি তাঁর প্রেমের কোনো সংশয় ছিল না। এর মধ্যেই ঘটে গিয়েছে দুর্বাসার অভিশাপের ঘটনা। শকুন্তলা রাজার প্রেমের স্মারক অঙ্গুরীয়টি হারিয়ে ফেলেন। ফলে বিধিতাড়িত রাজা পত্নী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যানের

Scanned with CamScanner

ব্যাপারে রাজার চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে না। কারণ এক্ষেত্রে তার নিজের কিছুই করার ছিল না। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন — 'দুষ্মন্তকে 'কাপুরকুষতার' দায় থেকে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।' শুধু তাই নয় শকুন্তলা প্রত্যাখানের ঘটনায় রাজার আর একটি দিকের সংযম এবং মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। শকুন্তলার রূপে বিমুগ্ধ হয়েও পরস্ত্রীস্পর্শজনিত দোষে কলংকিত হবার ভয়ে তিনি তাঁকে গ্রহণ করতে চাননি। — 'দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুল'।

আর একটি ঘটনায় দুষ্যন্তের ন্যায়পরায়ণতা ও স্বার্থহীনতার পরিচয় মেলে। তিনি অপরের ধন কোনো ছলেই আত্মসাৎ করতে চাননি। বণিক ধনমিত্রের মৃত্যু হয়েছে নৌব্যসনে। বণিক অপুত্রক। তৎকালীন বিধি অনুসারে বণিকের সমস্ত ধনরত্ন রাজার প্রাপ্য। কিন্তু বণিকের এক স্ত্রী গর্ভবতী জেনে তিনি ঘোষণা করেন, ঐ পত্নীর সন্তানই পিতৃঋনের উত্তরাধিকারী হবে। এই ঘটনায় অবশ্য অপুত্রক রাজার শূণ্যতা বোধটিও প্রকাশ করেছেন।

কখনও কখনও দুষ্যন্তকে চিত্ত-দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। রাজধানী থেকে 'করভক রাজার কাছে মাতার আদেশ নিয়ে উপস্থিত। তাঁর ব্রতর উপস্থিতি থাকবার জন্য রাজমাতা আদেশ পাঠিয়েছেন অন্য দিকে ঋষিদের অনুরোধে আশ্রমের রাক্ষস বিতাড়নের। এ দুটির মধ্যে কোনটি তাঁর পালনীয় এ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয় তাঁর মনে। অবশেষে বিদূষকের উপর মাতৃআজ্ঞা পালনের ভার দিয়ে রাজা দায়মুক্ত হয়েছেন। দুষ্যন্ত যে আদর্শ নরপতি তাতে সন্দেহ নেই। শাসক দুষ্যন্ত, প্রেমিক দুষ্যন্ত, বীর দুষ্যন্ত প্রভৃতি নানা পরিচয়ে নাটকে তাঁর চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দুষ্যন্ত চরিত্রের অসংযমের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে রাজমহিষী হংসপদিকার গীতে। দুষ্যন্ত কেবল আবেগবান প্রেমিকই নন, তিনি স্নেহপবণ পিতা তাই শকুন্তলার পুত্রকে দেখে তাঁর মধ্যে স্নেহব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সর্বদমনকে আত্মজ বলে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি।

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের দৃশ্য বড় মধুর ও চিত্তাকর্ষক। দুষ্যন্ত তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নতজানু হয়েছেন শকুন্তলার কাছে এখানেই তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্য।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে দুষ্যন্ত চরিত্রটিকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন। অনুবাদের সূচনাতেই তিনি বলেছেন — অতিপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্যন্ত নামে সম্রাট ছিলেন।' কাহিনির সমাপ্তিতে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ দুষ্যন্তের শকুন্তলার কাছে আত্মসমর্পনের প্রসঙ্গটি নিম্নলিখিত ভাবে লিখেছেন বিদ্যাসাগর —

> 'তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা পূর্বক তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপটে উপনীত হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কাল হরণ করিয়াছি তাহা আমার অ'ন্তরাত্মাই জানেন। ..... রাজা এই বলিয়া উন্মুলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।'

মহর্ষি মারীচ রাজা দুষ্যন্তকে সমস্ত মালিন্য মুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন দুর্বাসার শাপের জন্য তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। মহর্ষির এই উক্তিতে দুষ্যন্তের জীবনের অন্ধকার মেঘটুকু কেটে গেল। মহর্ষি দুষ্যন্তকে বলেছেন, স্ত্রী পুত্রসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কর এবং

Scanned with CamScanner

লোকাহিতে জীবন অর্পণ কর। রাজা দুষ্যন্ত অবনত মস্তকে ঋষির বাক্য শিরোধার্য করেছেন এবং বলেছেন প্রজার মঙ্গল কার্যেই প্রবৃত্ত হবেন।

শকুন্তলা

তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া তিলোত্তমা শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের অনন্যসৃষ্টি। বলা বাহুল্য শকুন্তলাই নাটকের মুগ্ধা ও মধ্যা নায়িকা। নাটকে শকুন্তলার প্রণয়িনীরূপটিরই প্রাধান্য পেয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। মাতা কর্তৃক পরিত্যক্তা হলে শকুন্ত অর্থাৎ কোন এক পক্ষী তার পক্ষাচ্ছাদনে শিশুটিকে রক্ষা করে। সেইজন্যই তাঁর নাম হয় শকুন্তলা। অসহায় এই শিশুকন্যাটিকে মহামতি কণ্ব নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং লালন পালন করেন। এর ফলে তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলা একান্ত হয়ে যান। অসাধারণ রূপলাবণ্য এবং প্রকৃতিক পরিবেশ মিলিয়ে শকুন্তলা ছিলেন এক স্বপ্নময় রাজ্যের অধীশ্বরী। অবশ্য একা শকুন্তলা সম্পূর্ণা ছিলেন না। তাঁর দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে পূর্ণতা দান করেছিল।

আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশে শকুন্তলার দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে রাজা দুষ্যন্তের আবির্ভাব ও প্রণয় নিবেদন তাঁর জীবনের সংযমের বাঁধ ভেঙে দিল। নবযৌবনা শকুন্তলার অন্তরে যে প্রণয় পিপাসা ছিল দুষ্যন্তকে অবলম্বন করে সেটি শতধারে উৎসারিত হল। শকুন্তলা সংযম রক্ষা করতে পারেননি। মদন প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে দুষ্যন্তের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন। এই পরিস্থিতিতেই দুষ্যন্তের সঙ্গে তাঁর গান্ধর্ব বিবাহ। এখান থেকেই শকুন্তলার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু।

পতি তথা প্রিয় ভাবনায় আত্মহারা শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্যে অবহেলা করলেন। ফলে বজ্রপাতের মতোই তাঁর জীবনে নেমে এল দুর্বাসার শাপ। পরবর্তী অংশে শকুন্তলার জীবনের মর্মান্তিক বেদনার ইতিহাস। কবি কালিদাস শকুন্তলাকে তাঁর স্বভাবের পথেই ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রেম লীলাচাঞ্চল্য, লজ্জাকে অতিক্রম করে প্রেমের কাছে আত্মসমর্পন সমস্তই মহাকবি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে শকুন্তলা চরিত্রের সরলতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন — 'শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই পরাভব সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা তাহার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে।"

রাজা দুষ্যন্ত ফিরে গিয়েছেন তাঁর রাজত্বে। দুর্বাসার শাপে বিস্মৃত হয়েছেন। শকুন্তলাকে বিবাহের প্রসঙ্গ। তারপর দুষ্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁকে। এরপর শকুন্তলার ভিন্ন মূর্তি। রাজসভায় শকুন্তলার দীপ্ত তেজস্বিনী মূর্তি আর আত্মিক শক্তির পরিচয় বহন করে তবে এই আঘাতের পরে শকুন্তলার ভিন্ন মূর্তি দেখতে পাই। এবার তিনি অপ্রগলতা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী — শকুন্তলার তপস্বিনী মূর্তি পবিত্রতা এবং সতীধর্মের আদর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শকুন্তলার পূর্ণতা তাঁর মাতৃত্বে। মারীচের আশ্রমে জননী শকুন্তলার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। রাজা দুষ্যন্ত এক নতুন শকুন্তলাকে দেখে পরম বিস্ময় লাভ করেছেন —

Scanned with CamScanner

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতি-নিষ্করুণ্য স্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ।।

অর্থাৎ শকুন্তলা পুত্র চরিত্রা, নিয়মহেতু কৃশাননা, যিনি ধূসর বস্ত্র পরিধান করে, একবেণী ধারণ করে দীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করছেন। মাতৃত্বের অসাধারণ গৌরবের মধ্যেই শকুন্তলার পতি-মিলন ঘটেছে। এই মিলন পরিপূর্ণতার, মঙ্গলের এবং মাধুর্যের। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন — 'শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে প্রেয়সীর সহিত দুষ্যন্তের ব্যর্থ প্রণয় ও শেষ অঙ্কে ভরত জননীর সঙ্গে উহার সার্থক মিলন।" জীবনে ভোগবাসনা উচ্ছল চিন্তা শূন্য প্রেম যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য তপস্যা এবং কৃচ্ছসাধন। যৌবনের দাবদাহের পর পরিণত শান্তি ও পরিপূর্ণতা। শকুন্তলার জীবন-কথায় এই সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগরে অনুবাদেও এই শকুন্তলার জীবন বিবর্তনের কাহিনিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যথাযথ ভাবে। কামনা-ব্যাকুল শকুন্তলার চিত্রিত করেছেন তিনি অনুবাদে —

"শকুন্তলা, দুই চারি পা চলিয়া, ছল করিয়া কহিলেন, অনসূয়া! কুশাগ্র দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে; এ জন্য আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না; আর আমার বল্কল কুরবক শাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া বল্কল মোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া শকুন্তলা সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

দুষ্যন্ত শকুন্তলার মিলন দৃশ্যটি অনুবাদে সার্থক হয়ে উঠেছে —

"রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা, অস্তব্যস্তে রাজার হস্ত ধরিয়া, কহিলেন, আর্যপুত্র! উঠ উঠ; তোমার দোষ কি; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এতদিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে।"

অনসূয়া — প্রিয়ংবদা ঃ

'একদিকে অনসূয়া অন্যদিকে প্রিয়ংবদা, মাঝখানে শকুন্তলা, একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার ছবি। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা আশ্রম কুমারী। শকুন্তলার প্রিয় সখী। কিন্তু এটুকু বললেই এই নবযৌবনা নারীর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। কোমলা, লজ্জাবতী, প্রেমে অনভিজ্ঞা শকুন্তলা একমাত্র সহায় এই দুই সখী। অনসূয়া প্রিয়ংবদা না থাকলে শকুন্তলার দেহ ও মনের বিকাশ সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথ তাই যথাযথই বলেছেন — 'এক শকুন্তলা শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বপেক্ষা অল্প।"

নাটকের সূচনা থেকে শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রা পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণই শকুন্তলার অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে আছে এই দুই' সখী। পরমপ্রিয় এই দুই সহচরী শকুন্তলার প্রতিটি কাজে সঙ্গ দান করেছে। এই দুই সহচরী সর্বাপেক্ষা গুরত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রেম বিনিময়ে। শকুন্তলা কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, সেই অবস্থায় এই দুই সখীই তাঁর

Scanned with CamScanner

হয়ে কথোপকথন চালিয়ে গিয়েছে রাজার সঙ্গে। যে কথা লজ্জাতাড়িত হয়ে শকুন্তলা বলতে পারেননি সে কথা অনায়াসে রসসিক্ত করে বলে দিয়েছে দুই সখী। শুধু তাই নয় বেতসকুঞ্জে রাজার সঙ্গে গোপন মিলনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দিয়েছে তাঁর দুই সখী।

শকুন্তলার প্রতি তাঁর সখীদ্বয়ের ভালোবাসার সীমা নেই। বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে পরমযত্নে রক্ষা করতে সবসময়ই এরা তৎপর। অনসূয়া প্রিয়ংবদা না থাকলে দুর্বাসার শাপে শকুন্তলার চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারত। অনিবার্য সর্বনাশ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন দুই সখী।

রূপেগুণে কর্ম তৎপরতায় এরা দু'জনেই সমান। তথাপি দুই সখীর মধ্যে গুণগত কিছু পার্থক্য আছে। অনসূয়া শান্ত গম্ভীর এবং বিবেচক। তাছাড়া সে যথেষ্ট দূরদৃষ্টি সম্পন্না। অন্যদিকে প্রিয়ংবদা চঞ্চল পরিহাসপ্রিয়। বাকচাতুর্যেও সে যথেষ্ট দক্ষ। সে দিক থেকে বিচার করলে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। গান্ধর্ব মতে বিবাহের পর অনসূয়া যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। কারণ সে জানে রাজার একাধিক মহিষী আছেন। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে শকুন্তলাকে বিস্মৃত হবেন কিনা এ বিষয়ে কিন্তু সংশয় ছিল তার মনে। দ্বিধাহীন চিত্তে এ বিষয়ে প্রশ্নও করেছে রাজাকে। এটি তার দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। দুর্বাসার শাপ একদিকে যেমন নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ অন্যদিকে তেমনি শকুন্তলা জীবনের এক চরম সঙ্কটময় অধ্যায়। শকুন্তলার এই চরম বিপদের দিনে তাঁর চরম সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয় অনসূয়া। অনসূয়াই কোপন স্বভাব দুর্বাসাকে অনুনয় বিনয় করে শাপমুক্তির উপায়টি জেনে নেয়। কিন্তু শকুন্তলার আশঙ্কা ও উদ্বেগের কথা মনে রেখে এই শাপের ব্যাপারটি তার কাছ থেকে গোপন রাখে দুই সখী। অবশ্য অনাগত বিপদের কথা চিন্তা করে পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলাকে অঙ্গুরীয় বিষয়ে পরোক্ষ ভাবে সাবধান করে দিতেও তারা ভোলেনি।

দুষ্যন্তের রাজসভায় অনসূয়া প্রিয়ংবদার অনুপস্থিতিতে শকুন্তলা নিরাবরণ। সেদিন ভয়ঙ্কর অপমান এবং লাঞ্ছনা থেকে শকুন্তলাকে রক্ষা করবার কেউ ছিলনা। যে স্নেহের আচ্ছাদন এতদিন শকুন্তলাকে ঢেকে রেখেছিল সেটি অপসারিত হওয়ার নিদারুণ একাকীত্বে দিশাহারা হতে হয়েছে শকুন্তলাকে।

অতএব বলা যায় নাটকের গতি ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে এই চরিত্রদুটির গুরুত্ব ও অবস্থান যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, মহাকবি কালিদাস এই দুই নবযৌবনা আশ্রম কুমারী দুটির প্রতি অবিচার করেছেন। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে অর্বাচীন কবি বলেছেন — 'কাব্য হীরার টুকরার মত কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি প্রিয়ম্বদা-অনুসূয়া শকুন্তলার কতখানি ছিল তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায় বিচার সংগত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি নিষ্ঠুর।'

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদে অনসূয়া প্রিয়ংবদা চরিত্র দুটিকে এবং শকুন্তলার সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্কের পরিচয়টি অতি যত্ন সহকারে চিত্রিত করেছেন। 'দুর্বাসার শাপের' ঘটনাটি

Scanned with CamScanner

পর সখীদ্বয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশক কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত হল —

"প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্বনাশ ঘটিল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোনোও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন; সখি যে সে নয় ইনি দুর্ব্বাসা, ইহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখা শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন।" যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবান। সে তোমার কন্যা তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক।"

অনসূয়া প্রিয়ংবদা মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার অনন্য সৃষ্টি। বিদ্যাসাগরের অনুবাদে তার পরিচয়টি যথাযথ মুদ্রিত।

Scanned with CamScanner